পবিত্র সরকার

বাংলা ভাষা এখন

ঘটনা আর উদ্বেগ

লেখাপড়া-জানা, একটু সচেতন বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষা এখন একটি বিশেষ উদ্বেগের দ্বারা চিহ্নিত। কখনও অতিরিক্ত, কিন্তু মূলত ক্ষণস্থায়ী আবেগ এই উদ্বেগকে একটু ঘুলিয়েও দেয়। এটা ঠিক যে, বাংলাভাষীর বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান— এইসব এলাকার ভূমিপুত্র বাঙালি আর ভারত আর পৃথিবীর নানা দেশে প্রবাসী বাঙালি মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা প্রায় সাতাশ-আঠাশ কোটি হবে। ভাষীগোষ্ঠীর দিক থেকে বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাষা, বিপন্ন ভাষাগুলির ইউনেস্কো-প্রকাশিত ক্রমাঙ্ক-তালিকায় ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান-জাপানি-রুশ যদি ০ বা শুন্য-সম্ভাবনাক্রমে থাকে তবে তাদেরই হিসেব অনুযায়ী বাংলার সম্ভাবনা ১, অর্থাৎ খুবই কম, তার মধ্যে একটি-দু'টি বিচিত্র খবর ভেসে এসে আত্মপ্রিয় বাঙালিকে বেশ দুলিয়েও দিয়ে যায়— যেমন সিয়েরা লিয়োঁ নামক খুব ছোট্ট আফ্রিকার দেশটিতে (বাংলাদেশি শ্রমিকদের সৌজন্যে) বাংলা তৃতীয় সরকারি ভাষা— কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাঙালির দুর্ভাবনা কাটে না। বাংলা ভাষা বাঁচবে তো? কতদিন বাঁচবে? মরে গেলে আমরা কী করব? বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা মরে গেলে আমরা আর বাঙালি থাকব না, হয়তো অন্য কিছু (মেকলির কথামতো ব্রাউন সাহেব, না গায়ের রং নিয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান?) হয়ে যাব, কারণ কে না জানে যে, ভাষার পরিচয়েই জাতির পরিচয়। ফলে 'বাঙালি' থাকব কী থাকব না, এই রকম একটা (আশা করি) সুদূর সংকটময় ভবিতব্য নিয়ে আমরা অস্বস্তিতে থাকি। আমাদের উদ্বেগ-অস্বস্তি প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আর উনিশে মে-র কাছাকাছি সময়ে ঘুরে ঘুরে আসে, সর্বত্র লেখায় লেখায় নানা ক্ষোভ আর কাতরোক্তি, কখনও নিজেদের এড়িয়ে গিয়ে অন্যদের প্রতি অভিযোগের আঙুল, তাই আমাদের হাহাকারের বুক-চাপড়ানি সম্ভবত চাঁদ থেকেও শোনা যায়।

ভাষার পরিচয়ে জাতির বা গোষ্ঠীর পরিচয়, এটা অবশ্য একটা গোল গোল কথা। এ দুই পরিচয় আলাদা করার জন্যে রাজনীতির ইতিহাস-ভূগোল কিছুটা সক্রিয় থাকে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বা কানাডার লোকেরা, অস্ট্রেলীয়রা, দক্ষিণ আফ্রিকানরা— সবাই মোটামুটি ইংরেজিই বলে, তবু তারা 'ইংলিশম্যান' নয়। কানাডার এক অংশের মানুষ ফরাসি বলে, কিন্তু তারা ফরাসি নয়। ফলে বাংলা ভাষা মরে গেলে আমরা কী হব সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনই করা যাচ্ছে না। ঐতিহাসিকরা অতীত নিয়ে গবেষণা করেন, জ্যোতিষীরা এই ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করে আমাদের জানান, আমরা কী হতে (সম্ভবত)

চলেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ইঙ্গবঙ্গ' ('অ্যাংলো-বেঙ্গলি'?) বলে একটা কথা চালু হয়েছিল, জানি না, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের মতো এই নামটা আমাদের জন্যে তোলা আছে কি না।

ভাষা মরে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু কথা

ভাষা নানাভাবে মরে যায়। কোনও দুর্যোগে বা প্রতিকূল ঘটনাসম্পাতে জনগোষ্ঠী পুরোটা নিঃশেষ হলে ভাষা মরে যায়— এ প্রক্রিয়া যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি নানা কারণে হতে পারে। এ প্রক্রিয়াগুলি ধীরগতি হতে পারে, আবার এক ঝটকায় হতে পারে। আস্তে আস্তে ভাষা মরে যায় মানে ভাষার নতুন প্রজন্ম আর সেই ভাষা বলে না, অন্য ভাষা বলতে শুরু করে, পুরনো ভাষা বলে শুধু বৃদ্ধ আর মধ্যবয়সিরা। ক্রমে এই শেষের দু'দলও মরে যায়, ভাষাও মরে যায়। প্রায়ই শোনা যায় যে, অমুক ভাষার শেষ একজন বা দু'জন বক্তা টিকে আছে। একজন বক্তা থাকলেও সে ভাষা মৃত, কারণ সে তো আর কারও সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলতে পারে না।

আমরা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে-ভয় করছি, সেটা এ ভাষার হঠাৎ মরে যাওয়া নয়, 'পপাত চ, মমার চ' গোছের কিছু নয়, রোগে ভুগতে ভুগতে জীবনীশক্তি হারিয়ে মরা। অর্থাৎ, আমাদেরও নতুন প্রজন্ম আর এ ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে শিখবে না। আগের যে সব প্রজন্ম বাংলা বলত, তারা বুড়ো হতে হতে মরে যাবে, নতুন প্রজন্মের মুখে নতুন ভাষা বাংলা ভাষাকে তাড়িয়ে তার জায়গাটার দখল নেবে। এ যেন সেই মরুভূমির তাঁবুতে ঠান্ডায় ঢুকে পড়া উটের গল্পের মতো, উটটি প্রথমে তাঁবুর কোনা তুলে একটু মুখটা ঢোকাল, তারপর আস্তে আস্তে তার পুরো শরীরটা ঢুকিয়ে পুরো তাঁবুটা দখল করে ফেলল, তাঁবুর মালিকের আর থাকার জায়গা রইল না। কিংবা আগের ওই রোগের রূপকটাকেই টেনে বলি, ভাষার শরীরে ছোট্ট একটা জায়গায় পচন ধরে ক্রমে সেটা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ভাষাকে মেরে ফেলল।

কোথায় ভাষা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

তাও ভাষাবিজ্ঞানীদের লেখায় বার বার বলা হয়েছে। অন্য ভাষার একটি পরিবার বা ছোট গোষ্ঠী আর-এক ভাষার লোকেদের মধ্যে গিয়ে বসত করল, চারপাশে আর তাদের ভাষা বলবার কোনও লোক নেই, সেখানে শিশুর ভাষা আস্তে আস্তে লুপ্ত হতেই পারে, সে প্রতিবেশের ভাষা শিখবে। প্রথমে মুখে, খেলার সাথীদের কাছ থেকে, পরে স্কুলে গিয়ে লেখার ভাষাটাও তাকে শিখতে হবে। বড় গোষ্ঠী হলে এই বিপদটা এড়াতে পারে, যেমন পেরেছে উত্তরাখণ্ডে, দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে বা মহারাষ্ট্রে বাঙালি উদ্বাস্তুরা। সেসব জায়গায় স্কুল-শিক্ষায় অন্তত বাংলা ভাষার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও তা কতটা কার্যকর হয়েছে তা বলা মুশকিল। ইদানীংকালে প্রযুক্তির উন্নতিতে মানুষের গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্নতা কমানোর নানা উপায় হাতে এসেছে। বহু দূরের প্রবাসীও সিডি, ভিডিয়ো, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে বৈদ্যুতিন-সূত্রে মূল ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, ফলে

কথাবার্তায়। বাংলাদেশ ভাষা-শহিদদের দেশ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উৎসভূমি, তবু বাংলাদেশের ঊর্ধ্বগামী মধ্যবিত্ত এই ভাষাব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নেই। সেখানে এখন দোকানে দোকানে ইংরেজিতে নামপাটা, কখনও বঙ্গাক্ষরে— 'বিক্রমপুর সুইট্‌স' বা 'মির্জা জেনারেল স্টোর্স' লেখা। সেখানেও অন্তত রাস্তাঘাটে 'লিখিত' প্রকাশ্য বাংলা ভাষা খুব সুখে নেই। যদিও পশ্চিমবাংলার তুলনায় সংক্রমণ, অন্তত মুখে একটু কম।

ইংরেজি রোগ কেন ধরল

এ রোগ এড়ানোর উপায় বাংলা ভাষার ছিল না। এ হল একরকমের ছোঁয়াচে রোগ। ছোঁয়াছুঁয়ি (contact) শুরু হয়েছিল সেই কবে, ইংরেজরা এ দেশে আসার পরেই। ১৯১৭-তে যে হিন্দু কলেজ হল তার শিক্ষার ভাষা হল ইংরেজি। তারপর ১৮৩৫ থেকে ইংরেজি হয়েছিল আমাদের রাজার ভাষা, ইংরেজি না শিখলে সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না, আদালতের কোনও কাজ করা যাবে না, এমনকী স্কুল-শিক্ষাতেও ইংরেজি ঢুকে গেল। আমরা, অর্থাৎ বেশিরভাগ নাগরিক মধ্যবিত্তরা, কার্যত দ্বিভাষী হয়ে গেলাম। এটা একটা অদ্ভুত দ্বিভাষিকতা— একটা ভাষা আমরা মুখে বলি, আর-একটা ভাষা আমরা লিখি বেশি, মুখে বলি কম।

কম বলি, কিন্তু ওই ভাষাটার রাজকীয় আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমার ভাষার চেয়ে অনেক বেশি। তাই ও ভাষাটা বললে নিজেকে ক্ষমতাশালী মনে হয়, ভারতের কোটি কোটি ইংরেজি না-জানা লোকের চেয়ে নিজেকে উঁচুদরের জীব মনে হয়। এ ভাষা বললাম তো আমি 'ভদ্রলোক' হয়ে গেলাম, অন্যেরা 'ছোটলোক' হয়ে আমার স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হল। ও ভাষার এমনই মহিমা যে ও ভাষার গালাগালিও সহনীয়, এমনকী মধুর মনে হয়। এই লেখকের নানা লেখায় উদ্ধৃত করা মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের নব কী বলছে দেখুন। বন্ধু শিবু নব-র একটা কথার উত্তরে বলেছে 'দ্যাট্‌স এ লাই'। শুনে নব দারুণ খেপে গিয়ে তাকে মারতে যায়। বন্ধুরা ধরাধরি করে তাকে সামলায়, তখন সে গজরাতে গজরাতে বলে, 'ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যেবাদী বল্লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু— লাইয়র— এ কি বরদাস্ত হয়?'

অর্থাৎ দ্বিভাষিকতা, সেই সঙ্গে নতুন ভাষাটার অতিশয় ক্ষমতা— যা থেকে ধার করলে 'শিক্ষিত'র আত্মাভিমান ফুলেফেঁপে ওঠে— এইসব মিলে আমাদের ভাষায় বুমিবুল-এর উৎপত্তি হয়েছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাংলা বুমিবুল-এর সঙ্গে ইংরেজি (গায়ের জোর বেশি), আর বাংলা (গায়ের জোর কম)— এই দু'টি ভাষা জড়িত। ইংরেজির গায়ের জোরের আরও একটা প্রমাণ এই যে, আমরা ইংরেজি শব্দের বানান ভুল করলে লজ্জায় নীল হয়ে যাই, কিন্তু বাংলা বানান তেমনভাবে শিখিই না, এবং ভুল করলেও গ্রাহ্য করি না। বরং বাংলা লেখার 'জটিলতা' নিয়ে গজগজ করি— এ ভাষার কোনও বুদ্ধিবিবেচনা নেই— কেন যে বাংলাটা দুটো 'ণ' আর তিনটে 'শ' বসে আছে, এই নিয়ে অভিযোগ করতে থাকি।

ইংরেজি বানান আর উচ্চারণ পদ্ধতিতে যে এর চেয়ে ঢের বেশি অসঙ্গতি আছে তা লক্ষও করি না। চিনা জাপানি লেখার কথাটা আর নাই-বা তুললাম।

তাই ভাষাপ্রেমিকদের বিশ্বাসে বাংলা ভাষার মারণরোগের আর-এক নাম হল ইংরেজি।

এই রোগ ছড়িয়ে বাংলা ভাষাকে মেরে ফেলবে?

যেমন কুষ্ঠ বা ক্যানসার ছড়িয়ে যায় সর্ব দেহে, সেই ভাবে? আমরা কিন্তু মনে করি না সে সম্ভাবনা খুব আসন্ন। শহর অঞ্চলের কিছু কাছাখোলা বাঙালি এই বুমিবুল-ওয়ালা কিম্ভুত বাংলিশ বলে তাতে সন্দেহ নেই। আবার কিছু অভিভাবকও আছে, তাদের মধ্যে মুখে বাংলা ভাষাপ্রেমিকদের কেউ কেউ থাকতেও পারে যে, সন্তানদের তারা ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলে পড়িয়ে ইংরেজিতে সড়গড় করতে চায়, যাতে তারা ফটাফট-সটাসট ইংরেজি বলতে পারে। এই অভিভাবকদের মধ্যেও আবার দুটো দল আছে। একদল সন্তানদের বাংলাটাকেও শেখাতে চায়, অন্তত বাড়িতে বাংলা বইটই রাখে, সন্তানদের অন্তত বাংলার প্রতি বিমুখ করে তোলে না। আর এক দল আছে তারা বলে 'ও ছাতার বাংলা-ফাংলা পড়ে কী হবে, ঘাস কাটবি?' তারা সন্তানদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে চায়, পথে গরু দেখলে আর বেড়াল দেখলে ছেলে-মেয়ে cow বা cat না বললে রাগ করে। এদের সাহায্য করে এক শ্রেণির ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নির্বোধ শিক্ষকেরা, যারা বলে, 'খবরদার, বাড়িতেও মাতৃভাষা বলবে না, ইংরেজিতে ডুবে থাকবে!' এরা জানে না যে, আধুনিক ভাষা শিক্ষণপদ্ধতিতে মাতৃভাষার ভূমিকার কতটা গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সন্তানদের ইংরেজি শেখাতে— সটাসট ফটাফট ইংরেজি বলতে পারার মতো ইংরেজি শেখাতে চাওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ ইংরেজি আমাদের সামাজিক মর্যাদা আর সম্ভাব্য বিত্তশালিতার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তার জন্যে মাতৃভাষাকে 'ছ্যা-ছ্যা' করতে হবে— এই প্রস্তাবে আমরা নেই।

তা সত্ত্বেও কি বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গে এই রোগ একসময় ছড়িয়ে যাবে, বাংলার আর বাংলাত্ব বলে কিছু থাকবে না একদিন? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, কমলকুমার থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলের লেখা একসময় হরপ্পার লিপির মতো হয়ে যাবে, জাদুঘরের সামগ্রী, এক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রনাথ পড়বে না? পাগল নাকি? তা অত সহজে হয় না। যে-ভাষার এমন সাহিত্য আছে, যে-সাহিত্যে থেকে পুরো জাতি প্রাণের রসদ পেয়ে চলেছে, অবিরাম সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে, তা অমন রুগ্‌ণ হয়ে মরে না। এত পত্রপত্রিকা— (দুই বাংলায় কম-বেশি ৬০টি দৈনিক পত্রিকা, শত শত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক, অনিয়মিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা তো অগণিত বেরচ্ছে, কোটি কোটি লোকে পড়ছে, নিউ ইয়র্কেও একটি বাংলা দৈনিক বের করেন বাংলাদেশি বন্ধুরা), এত গদ্যপদ্যের বই বেরচ্ছে প্রতিদিন— প্রতি দিনই তার সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না— এই অবস্থায় বাংলা ভাষার, মুখের হোক, লেখা বা মুদ্রণের হোক, সম্পূর্ণ বিলয় কল্পনা করা কিছুটা দুঃখবিলাস বলেই মনে হয়। শুধু

ছাপা বইপত্র নয়, বাঙালির মুখে মুখে যে-অজস্র গান ফেরে, হাজার হাজার গান— পল্লিগীতি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে সলিল চৌধুরী থেকে কবির সুমন থেকে অনুপম রায় বা আরও সদ্যতন পর্যন্ত— তার স্রোত বন্ধ হবে, বাংলা নাটকের অভিনয়, সিনেমার নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন ভাবাও কঠিন। টেলিভিশনে অবিশ্বাস্য আর আজগুবি (আর রীতিমতো অপকারী) ধারাবাহিকগুলোর দর্শক জুটবে না আর, এরকম একটা ভবিতব্য আমরা ভাবতে পারছি না। বাংলার মতো এত আত্মসচেতন, হয়তো কিছুটা আত্মগর্বী (গর্বের কিছু কারণ অবশ্যই আছে, তার তালিকা এখানে দিচ্ছি না) সংস্কৃতির আধার যে-ভাষা তা সহজে মরবার জন্য খাদের প্রান্তে এতদূর এসে পৌঁছয়নি। কখনও পৌঁছবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

তবু কী কর্তব্য আমাদের?

আশু কর্তব্য বলতে যা বুঝি তা হল ওই কাছাখোলা বাংলা বা বাংলিশ না বলা, কাউকে বলতে শুনলে টিটকিরি করা বা একটু নরম-গরম খোঁচা দেওয়া। বাংলার একটা চেনা চেহারা আছে। সেই চেহারার মধ্যে অকারণে ইংরেজি শব্দ ঢোকালে তা বাংলিশ হয়। বাংলার এই চেনা চেহারাটা নিজেরা বলবার চেষ্টা করা, সন্তানদের বলতে উৎসাহ দেওয়া। তারা ফুর্তি করে ইংরেজি শিখুক না, কে আটকাচ্ছে? এ বিষয়ে আমার আগেকার একটা লেখার শিরোনাম ছিল 'বাংলা ভুলিয়ে দেওয়ার দরকার নেই'। এই কথাটাই আমি বার বার বলি। আমাদের অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকেরা ভাবেন, একটা ভাষা আর-একটা ভাষার শত্রু, ইংরেজি শেখাতে হলে মাতৃভাষাটাকে সিঁড়ির তলায় কয়লার স্তূপে নির্বাসন দিতে হবে। এ ধারণা ভুল। শিশুরা মুখে যেমন, তেমনই লেখার ক্ষেত্রেও দুটো বা তিনটে ভাষা শিখে নিতে পারে, যদি শিখনপ্রণালী তাদের সাহায্য করে।

লেখায় অবশ্য খুব-একটা বুমিবুল ঘটে না, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি। কিন্তু মুখে আমরা অসচেতন আর আলগা ভাষা ব্যবহার করি বলে বাংলিশ বেশি চলে আসে, তাই মুখের ভাষাটাকে আমাদের খেয়াল করে বলা উচিত। বাংলা অনার্সের ছেলে-মেয়েরা সাম্মানিক না বলে 'অনার্স' বলুক না হয়, কিন্তু 'বেঙ্গলিতে অনার্স' যেন না বলে।

তা হলে কি একেবারেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করব না?

মোটেই সে কথা বলছি না আমরা। আমরা যাকে বলে ভাষা-বিশুদ্ধিবাদী বা purist, তা একেবারেই নই। পৃথিবীর সব বড় ভাষাই অন্য ভাষা থেকে ভাষাস্পর্শের ফলে প্রচুর শব্দ ধার করে, যে ধার আর ফিরিয়ে দিতে হয় না। ইতিহাসের নানা পর্বে বাংলা ভাষাও সংস্কৃত ভাষা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক শব্দ পেয়েছে, আবার অনেক শব্দ পরে ধারও করেছে। তেমনই নিয়েছে ফারসি, আরবি, ইংরেজি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা থেকে। অন্যান্য ভাষা থেকেও বাংলায় প্রচুর ধার আছে। আগেই বলেছি, এই ধার যেহেতু ফিরিয়ে দিতে হয় না, এগুলি ক্রমে ভাষার সম্পদ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রকাশের শক্তি আর বৈচিত্র বাড়াতে সাহায্য করে। এ শব্দগুলির আর বিকল্প থাকে না। তাই চেয়ার, টেবিল, ফ্যান,

সুইচ, কম্পিউটার, ভ্যান, লোকাল (ট্রেন), স্টেশন, গুদাম, ট্যাক্সি, ব্যাংক, এটিএম ইত্যাদি প্রচুর শব্দ বাংলায় এসে বাংলা হয়ে গেছে, সেগুলি স্বচ্ছন্দেই আমরা ব্যবহার করব— মুখে হোক, লেখায় হোক। আরবি-ফারসি শব্দ সম্বন্ধেও এক কথা। কোথাও কোথাও প্রতিবেশ কোনও ধরনের শব্দের একটু বেশি ব্যবহার দাবি করবে, যেমন আইন-আদালতের ভাষায় ফারসি, ইসলাম ধর্মের আলোচনায় আরবি বা কম্পিউটার-বিদ্যা, ডাক্তারি, বিমান-পরিচালনা বা অন্যান্য প্রযুক্তির আলোচনায় ইংরেজি, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় আর লেখায় মাত্রাছাড়া ইংরেজি ব্যবহার করে বাংলা ভাষার একটা সর্বাঙ্গে ঘা-ওয়ালা চেহারা দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। 'আমি অ্যাকচুয়ালি ও কথাটা বলতে চাইনি' না বলে 'আমি আসলে' বললে কী হয়?

কোথাও কি ভরসার কথা আছে?

ভরসার এক নম্বর কথা হল, বাংলা ভাষার সব স্তরে এই রোগটা এখনও ধরেনি। গ্রামের বাঙালিদের কথায় এত বেশি ইংরেজি শব্দের খই ফোটে না, যদিও তাঁরা 'বাংলা-হয়ে যাওয়া' ইংরেজি শব্দ অনেক ব্যবহার করেন। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে অনেকদিন থেকে, তাদের কথাবার্তায় হয়তো আরও কিছু ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়বে।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যারা কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে খিচুড়ি করে, তারা সবাই যে ইংরেজি ভাল জানে তা কিন্তু নয়। তারা হয়তো দেখাতে চায় 'দ্যাখো, আমরা কেমন ইংরেজি জানি', কিন্তু দু'ছত্র ইংরেজি বলতে বা লিখতে গেলে তাদের দাঁত বা কলম ভাঙবে এমনও হতেও পারে।

আগে এ প্রসঙ্গটা ছুঁয়ে গেছি যে, বাংলা ভাষার আর-একটা স্তর হল লেখার স্তর। এই বাংলিশ এখনও মূলত মুখের বাংলার লক্ষণ, লেখা বা মুদ্রিত বাংলা যেখানে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির আশ্রয়, সেখানে এই বুলি-মিশ্রণ খুব একটা দেখা যায় না। গল্প-উপন্যাস-নাটকে সংলাপে মধ্যবিত্ত চরিত্রের বাস্তবতা দেখানোর জন্য এই খিচুড়ি সংলাপ আসতেই পারে, তবে সবাই খিচুড়ি বাংলা বলবে এমনটা প্রায়ই ঘটে না। কবিতায় ইংরেজি শব্দ বিশেষ্যের (বস্তু বা ধারণার নাম) বাইরে ইংরেজি শব্দ কম আসে। মুখে যেমন, 'বাট্', 'প্র্যাক্‌টিক্যালি', 'অ্যাকচুয়ালি', 'ওকে', 'ফাইন' ইত্যাদি মুহুর্মুহু শোনা যায়, লেখার বাংলায় এগুলো থাকেই না। বইয়ে, পত্রপত্রিকায়, খবরের কাগজে যে-বাংলা মুদ্রিত দেখি, তার মধ্যে খিচুড়ির লক্ষণ এখনও দেখা দেয়নি। প্রবন্ধের ভাষায় অপ্রয়োজনে গুঁজে দেওয়া ইংরেজি শব্দও স্বাভাবিক নয়, লেখকেরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে বাধ্য হলে আগেই তা বলে নেন। ফলে খিচুড়ি শহুরে মুখের বাংলার লক্ষণ হলেও লেখার বাংলার নয়।

আর-একটা কথা। আগেই বলেছি, রাজার ক্ষমতা আর বিত্তের ক্ষমতা দুই মিলে বিশাল প্রতাপশালী ইংরেজি এখন সারা পৃথিবীর ভাষার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তাই এই রোগ একা বাংলা ভাষাকে ধরেনি। ভারতে যেমন 'বাংলিশ' চলে, তেমনই হিংলিশ (হিন্দি+ইংলিশ), তাম্‌লিশ (তামিল+ইংলিশ), পান্‌লিশ (পাঞ্জাবি+ইংলিশ) ইত্যাদি সবই তৈরি হয়েছে, সকলেই এই ব্যাধির চিকিৎসা খুঁজছে। জাপানি, চিনা, আধুনিক ফারসি ইত্যাদি কোনও ভাষাই এই

ছোঁয়াচে রোগ এড়াতে পারেনি। ব্যাধিটা মহামারির আকার নিয়েছে বলা যায়। এটা ভরসার কথা কি না জানি না। তবে অনেকের ভাষার এই অসুখ হওয়ার একটা সুবিধে হল অনেকে এর প্রতিষেধকের কথা ভাবছে, প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে। ভাষার আত্মতার যুদ্ধ আর একক বা নিঃসঙ্গ যুদ্ধ থাকছে না। অন্যদিকে, আমাদের এই সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলির লড়াইয়ের সঙ্গে এর মধ্যেই 'বিপন্ন' ভাষাগুলির লড়াইও যুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, যেগুলি মরে যাচ্ছিল, মরে যাওয়াই তাদের অমোঘ ভবিতব্য বলে তার বক্তারা আর অন্যেরা ধরে নিয়েছিল, সে সব ভাষা এখন ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে, সারা পৃথিবীতে বিপন্ন ভাষার বিপন্নতা স্থগিত করে তার উজ্জীবনের চেষ্টা হচ্ছে। সেই লড়াইয়ে আমাদের ভাষাও কিছুটা উৎসাহ পাবে, সন্দেহ নেই।

যা দরকার, তা হল তীক্ষ্ণ সচেতনতা

শেষে হয়তো আগেকার কিছু কথার পুনরাবৃত্তিই থাকবে। আসল কথা হল, বাংলা ভাষাটাকে যাতে বাংলা ভাষা বলে চেনা যায়, সেইভাবে তাকে বলতে হবে আর লিখতে হবে। এ কাজ এমন কিছু কঠিন নয়। বাঙালি লেখকদের অজস্র লেখার ঈশ্বর্য আমাদের সামনে ছড়িয়ে আছে, তা থেকে আমরা লেখা আর বলা দুয়েরই আদল পেতে পারি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, ইংরেজি শব্দ ('বাংলা-হয়ে-যাওয়া' ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে বলছি) ব্যবহার না করে বাংলা দিব্যি বলা যায়, তার জন্যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করারও দরকার হয় না। একটা আড়ষ্ট, কৃত্রিম ভাষা তৈরি করারও দরকার হয় না। স্বাভাবিক বাংলা— যার মধ্যে সংস্কৃত ইংরেজি আরবি ফারসি-পর্তুগিজ ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ এসে ঢুকেছে, ঢুকে সাধারণ মানুষের চেনা ভাষায় চেনা হয়ে গিয়ে স্থান নিয়েছে— তা বলতে হলে অকারণ চোখে-খোঁচা-মারা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের আর দরকার হয় না। এটা যদি সব বাঙালি মনে রাখেন তা হলে 'বাংলিশ' তারা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারেন।

অবশ্য, যদি তাঁরা তাই চান। অনেকে ইংরেজি জানার অহঙ্কার জাহির করতে চান, তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলছি। আগেই বলেছি, তাঁরা সবাই যে ইংরেজি জানেন তা নয়। সত্যিকার ইংরেজি জানা লোক কখনও বাংলিশের কারবার করেননি বা এখনও করেন না। এঁদের বাংলা লেখা আমরা অনেকেই পড়েছি, অনেকের বাংলা বক্তৃতাও শুনেছি। নীরদ চৌধুরী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত থেকে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অশোক মিত্র, অমিয় বাগচি, সৈয়দ শামসুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (এ দু'জন যে বাংলাদেশের তা আশা করি বলতে হবে না), সুকান্ত চৌধুরী, মালিনী ভট্টাচার্য, চিন্ময় গুহ— আরও বহু নাম করতেই পারি। বাংলিশ যাঁরা বলেন, তাঁরা অনেকে খেয়াল করেন না যে তাঁরা বাংলিশ বলছেন, এঁরা হলেন কাছাখোলা বক্তা বা বক্ত্রী। এই কাছাখোলাদের নিজেদের কথা বলার ওপর নজর রাখতে হবে। কিন্তু অন্যরা কেউ কেউ যদি এমন মনে করেন যে এতে

তাঁদের ইংরেজি জ্ঞান দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ হবে, তবে সে আশা মরীচিকা মাত্র। বাংলিশ ভাষাটা বাংলা আর ইংরেজি দুটো ভাষাতেই চূড়ান্ত মূর্খতার চিহ্ন। তাঁদের সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীকে রবীন্দ্রনাথের বলা একটা কথাকে একটু বদলে বলা যেতে পারে, 'স্যর, দিদিমণি, আপনারা না শিখলেন ইংরেজি আর বাংলাটাও ভুলে গেলেন'— আপনাদের নিয়ে কী করি আমরা। 'বাংলাটা ভুলে গেলেন'— এ কথাও হয়তো অতিরঞ্জন হবে, কারণ বাংলাটাও তাঁরা কখনওই খুব ভাল করে শেখেননি। সেই ভালবাসা তাঁর নিজের ভাষাকে দেননি।

বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক। আমাদের সন্তানেরা দারুণ ইংরেজি ফরাসি হিব্রু বা বান্টু শিখুক, কিন্তু বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত বাঙালির যে অতিসমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তার থেকে তাদের বঞ্চিত করার কথা আমরা যেন ভুলেও না ভাবি।